কিন্ডারগার্টেন বাণিজ্য আর শিক্ষা এবং প্রতিভা বিকাশের সুযোগ

দেশের বেসরকারী শিক্ষা-ব্যবস্থা ক্রমেই ব্যয়বহুল হয়ে পড়ছে এবং তা ক্রমান্বয়ে আবারও সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে চলে যাচ্ছে। এক সময় প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষা ব্যবস্থাই শুধু বেসরকারী ছিল। ক্রমে এই অবস্থার পরিবর্তন ঘটে, মাধ্যমিক এবং উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রেও বেসরকারী শিক্ষা-ব্যবস্থা চালু হয়। বেসরকারী স্কুল-কলেজ পরিচালনায় সরকারী অনুদান বেশী। আর এসকল ক্ষেত্রে সরকারের সুনির্দিষ্ট কিছু নিয়ম-কানুনও আছে। সে নিয়ম-কানুন কতটা মান্য করা হচ্ছে, সে প্রশ্ন অবশ্য ভিন্ন। কিন্তু আছে। বেসরকারী পর্যায়ে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রেও সরকার কিছু নিয়ম-কানুন বেঁধে দিয়েছেন। কিন্তু এসব নিয়ম-কানুনের উর্ধ্বে আছে বোধ হয় হাজার হাজার বেসরকারী কিন্ডারগার্টেন স্কুল।

স্বাধীনতার পর এসব কিন্ডারগার্টেন স্কুল যখন প্রতিষ্ঠিত হতে শুরু করে, তখন সরকারী প্রাইমারী স্কুলের বিকল্প হিসাবে উঠতি মধ্যবিত্ত শ্রেণী তাদের সন্তানদের কিন্ডারগার্টেন স্কুলে পড়াতেই অধিকমাত্রায় আগ্রহী হয়ে ওঠেন। তার কারণও ছিল। দেশের সরকারী স্কুলের শিক্ষার মান ক্রমেই পড়ে যেতে থাকে। তাছাড়া সেখানে শিক্ষার উপযুক্ত পরিবেশও নিশ্চিত করা কঠিন হয়ে পড়ে। সরকারী প্রাইমারী স্কুলের শিক্ষা বিনা বেতনে হলেও উল্লিখিত কারণে বেতন দিয়ে সন্তানদের কিন্ডারগার্টেন স্কুলে ভর্তি করতে শুরু করেন সঙ্গতিসম্পন্ন অভিভাবকরা। এমনকি মধ্যবিত্ত শ্রেণীও। আর সেই সুযোগে ঘরে ঘরে কিন্ডারগার্টেন স্কুল প্রতিষ্ঠা করা শুরু হয়। বেসরকারী ক্ষেত্রে প্রাইমারী স্কুল প্রতিষ্ঠার জন্যও সরকারী কিছু নিয়ম-কানুন আছে। ভবন থাকতে হয়, খোলা মাঠ থাকতে হয়, যোগ্য শিক্ষক থাকতে হয়। এসব নিয়ম-কানুন ও শর্ত পূরণ করেই বেসরকারী প্রাইমারী স্কুলগুলো সরকারী অনুদান লাভ করে। কিন্তু কিন্ডারগার্টেন স্কুল প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে এমন কোন বাঁধাধরা নিয়ম নেই। স্রেফ বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের মত, দোকানপাটের মত বেশীরভাগ স্কুল পরিচালিত হয়।

এছাড়া এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র-বেতনের ক্ষেত্রেও কোন নিয়ন্ত্রণ নেই। একেবারে কিন্ডারগার্টেন পর্যায়ে তিন/চার বছরের ছেলেমেয়েকে ভর্তি করতে কোন কোন প্রাথমিক পর্যায়েই ৪/৫ হাজার টাকা লাগে। এর ছাত্র-বেতনও মাসিক তিনশ' টাকা থেকে দুই হাজার টাকার মধ্যে। এছাড়া প্রতিবছরই এ বেতন বাড়ানো হয় যথেচ্ছভাবে।

খামখেয়ালিভাবে বেতন বৃদ্ধির জন্য বনানীর একটি স্কুলের বিরুদ্ধে মামলা করেছিলেন অভিভাবকরা। সে মামলায় আদালত রায় দিয়েছিল বেতন বৃদ্ধি স্থগিত রাখার জন্য। দৈনিক ইত্তেফাকের খবরে বলা হয়েছে, স্কুলের কর্তৃপক্ষ আদালতের সে নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে বেতন ঠিকই বাড়িয়ে দিয়েছেন। আর একটি স্কুলের কথা উল্লেখ করে পত্রিকার রিপোর্টে বলা হয়েছে, যে স্কুলে ১৯৯৫ সালে প্লে-গ্রুপের একজন শিশুছাত্রের বেতন ছিল পাঁচ শত টাকা, ১৯৯৭ সালের জানুয়ারী থেকে ওই শ্রেণীর ছাত্র বেতন ধার্য করা হয়েছে আট শত টাকা। একই স্কুলের নার্সারী শ্রেণীর বেতন ছিল ৬০০ টাকা। জানুয়ারী থেকে ওই শ্রেণীর বেতন নির্ধারণ করা হয়েছে ৯০০ টাকা। কোন কোন ক্ষেত্রে পরিস্থিতি এমন যে, কি পড়ানো হচ্ছে সেটা বড় কথা নয়, বড় কথা হচ্ছে বেতন না বাড়ালে স্কুলের স্ট্যাটাস ঠিক থাকে না। এমন এক পরিস্থিতির অসহায় শিকার হচ্ছেন মধ্যবিত্ত শ্রেণী।

শুধুমাত্র প্রাইমারী বা মাধ্যমিক পর্যায়েই নয়। দেশের নবপ্রতিষ্ঠিত বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় ও মেডিক্যাল কলেজের পরিস্থিতিও একই রকম। এসব বিশ্ববিদ্যালয় বা উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হতেই লক্ষ লক্ষ টাকার প্রয়োজন হয়। তার ওপর মাসিক ছাত্র বেতন ১০ হাজার টাকা থেকে ১৫ হাজার টাকা পর্যন্ত। এসব প্রতিষ্ঠানের শিক্ষা মধ্যবিত্ত শ্রেণীরও ধরা-ছোঁয়ার বাইরে।

উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বেতন নামমাত্র। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ুয়া একজন ছাত্রের মাসিক বেতন মাত্র বারো টাকা। হলে সীট পেলে তার জন্য মাসে দিতে হয় মাত্র পাঁচ টাকা। কিন্তু উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আসন সংখ্যা সীমিত থাকার ফলে সেখানে ভর্তির সমস্যা আছে। যত সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী প্রতিবছর বিশ্ববিদ্যালয় বা উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির যোগ্যতা অর্জন করে, তার এক-চতুর্থাংশও তাতে ভর্তির সুযোগ পায় না। ফলে বিপুল সংখ্যক মেধাবী ছাত্র-ছাত্রী উচ্চশিক্ষা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। দেশ তাদের মূল্যবান সেবা থেকেও বঞ্চিত হচ্ছে। আমরা যদি আমাদের বিপুল সম্ভাবনাময় ভবিষ্যৎ বংশধরদের যোগ্য নাগরিক হিসাবে গড়ে তুলতে না পারি, গড়ে তোলার সুযোগ সৃষ্টি করতে না পারি, তাহলে দেশের উন্নতির গতি স্তিমিত হয়ে পড়বে।

এদের মধ্যে যারা সক্ষম তারা মাসে বিশ হাজার টাকারও বেশী খরচ করে নিজেদের সন্তানদের হয় দেশের এসব ব্যয়বহুল উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পড়াচ্ছেন অথবা পড়াচ্ছেন বিদেশে। সেক্ষেত্রে উচ্চশিক্ষায় বৈষম্যও সৃষ্টি হচ্ছে। যে ছাত্র উপযুক্ত যোগ্যতার অভাবে হয়ত বাংলাদেশের কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির জন্য আবেদনই করতে পারেনি, সে কেবল অর্থবিত্তের জোরে বিদেশ কিংবা স্বদেশেরই বেসরকারী উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে ডিগ্রি নিয়ে আসছে। আর পাস করছে দু'এক বছর আগে। কারণ বেসরকারী উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বা বিদেশের কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে সেশন জট নেই। ফলে তারা পছন্দমত চাকরিতে ঢোকার সুযোগও পাচ্ছে আগে। এই পরিস্থিতি দেশীয় সরকারী বা স্বায়ত্তশাসিত উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষায় শিক্ষিত তরুণ-যুবকদের মধ্যে হতাশার পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারে। আর এর পরিণতি ঘটতে পারে মেধাবী ছাত্রদের ভাগ্যান্বেষণে বিদেশ যাত্রা। এভাবেও জাতি বঞ্চিত হতে পারে তাদের সেবা থেকে।

শিক্ষা খাতে প্রাইমারী স্কুল থেকে উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার এই পরিস্থিতি স্বাস্থ্যকর নয়। বেসরকারী শিক্ষার আরও বিকাশ ঘটুক, উচ্চশিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধি পাক এটা ছাত্ররা যেমন চায়, তেমনি চান অভিভাবকরা। কিন্তু সেই শিক্ষা যদি সাধারণ মানুষের জন্য সোনার হরিণে পরিণত হয়, তবে তা হবে খুবই দুর্ভাগ্যজনক। সরকার পরিচালিত এবং সরকারী অনুদানপ্রাপ্ত দেশের প্রাইমারী ও মাধ্যমিক শিক্ষার মান যে ভাল নয় এসএসসি-এইচএসসি পরীক্ষার ফলাফল পর্যালোচনা করলেই তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। সামান্য ব্যতিক্রম ছাড়া যারাই এসব পরীক্ষায় ভাল রেজাল্ট করে অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে, তারা নির্দিষ্ট কয়েকটি ভাল স্কুলে পড়াশোনা করেছে এবং প্রাইভেট পড়ানোর জন্য তাদের অভিভাবকদের মাসে হাজার হাজার টাকা খরচ করতে হয়েছে। এও এক ধরনের শিক্ষা বাণিজ্য ও আর এই বাণিজ্যের সঙ্গে জড়িত আছেন সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের একশ্রেণীর শিক্ষকরাই। যে শিক্ষা তিনি প্রাইভেট পড়ালে দিতে পারেন একই শিক্ষা কেন দিতে পারেন না ক্লাসরুমে- সেও এক বিরাট প্রশ্ন।

আমরা মনে করি, বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষা ক্ষেত্রে অযৌক্তিক ব্যয়বহুলতা, মাত্রাতিরিক্ত ছাত্র-বেতন প্রভৃতি বিষয়ে সরকারের একটি সুনির্দিষ্ট নীতিমালা থাকা প্রয়োজন। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কোন মুদী দোকান বা বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান নয় বলেই এ ব্যাপারে সরকার সুনির্দিষ্ট নীতিমালা প্রণয়ন করতে পারেন। কেউ কেউ এমনও যুক্তি দেখাতে পারেন যে, আমরা সরকারী অনুদান গ্রহণ করি না, তাই সরকারী কোন খবরদারিও মানি না। একথার মধ্যে হয়ত যুক্তি আছে। কিন্তু শিক্ষা নিয়ে এমন যুক্তি মেনে নিলে জাতির ভবিষ্যৎই তমসাচ্ছন্ন হয়ে পড়বে।

সমাজে বিত্তের সঙ্গে সবকিছুর কোন না কোন সম্পর্ক আছে ঠিকই, কিন্তু সে বিত্ত যদি সাধারণভাবে প্রতিভা বিকাশের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে, শিক্ষা ক্ষেত্রে বৈষম্যের সৃষ্টি করে তবে তাতে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠায় দোষের কিছু থাকবে না। শিক্ষার ক্ষেত্রে বিরাজমান সংকট দূর করার জন্য সরকারী-বেসরকারী স্কুল-কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা যেমন জরুরী, তেমনি জরুরী সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে উন্নতমানের অভিন্ন কারিকুলাম। আশা করি, কর্তৃপক্ষ বিষয়গুলি গুরুত্বের সঙ্গে ভেবে দেখবেন।

— দর্শক

দৈনিক বাংলা
17
19 DEC 1998